কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে কাপালিকের তান্ত্রিকতা এবং কৌলিন্য প্রথাকে উৎরে আধুনিক দাম্পত্যের সুর ভেসে যায়

আবু হেনা মারুফ ইমরান
শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উনিশ শতকের সমাজব্যবস্থাকে ঘিরে যে সমস্যাগুলো ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছিল এবং সমাজকাঠামোকে অনেকাংশে দুর্বল করে মানুষকে মানবিক পর্যায় থেকে রীতিমতো দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সেই সমস্যাগুলোর মধ্যে কৌলিণ্য প্রথা ও বহুবিবাহ ছিলো শীর্ষে; আর কাপালিকের তান্ত্রিকতা অনেকাংশে অনুষঙ্গ হিসেবে পাওয়া গেলেও বেশ জোর দিয়ে বলা চলে না। তবে আমার এই নিবন্ধের কিছু অংশে তা বেশ জোরালোভাবে আসবে আলোচনার স্বার্থে। ইউরোপীয় সমাজের প্রভাবে আমরা বহুকাল থেকে রীতিমতো প্রভাবিত হতে হতে এখন বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেছি; তাই খুব সহজে বিচার করতে পারি না যে, যা এখন অনায়াসসাধ্য তা ঠিক কতটা সহজসাধ্য ছিল দুই শতাব্দি আগে। এই নিবন্ধে আমরা সেই সাধ্য আর অসাধ্যের যোগসূত্র স্থাপন করবো।

বাংলা সাহিত্যের অগ্রদূত বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যকে যে আধুনিকতার পথ দেখিয়েছিলেন আজ অবধি আমরা সেই পথেই চলেছি কোনোরূপ দ্বিধা ছাড়াই। উনিশ শতকে দাড়িয়ে তিনি যেসব প্রথার দিকে আঙুল তুলে রীতিমতো ধমকালেন তা যে অসামান্য সাহসিকতার পরিচয় তা বাঙালি মাত্র স্বীকার করবেন, আর অবাঙালি হলেও আপনার স্বীকার করতে খুব একটা সমস্যা হবে না। এবার আলোচনাকে মূলের দিকে ফেরানো যাক-

বঙ্কিমচন্দ্র তার সমকালের সমস্যার সমাধান খুঁজতে অতীতকে খুব যত্নে ব্যবহার করেছেন। তাঁর ‘কপালকুণ্ডলা’ উপন্যাসের পটভূমি আঁকলেন আজ থেকে প্রায় সাড়ে চারশত বছর আগের একটি কল্পিত সময়ের প্রেক্ষাপটে। সমকালকে অতীতের মাঝে বেশ মুন্সীয়ানার সাথেই মিলিয়ে সমস্যাগুলোর সমাধান খুঁজতে থাকেন; এই নিবন্ধ সেই আলোচনাকে ঘিরেই।

প্রজারা সৎ পথে চলবে, সৎ কাজে এগিয়ে আসবে এমন উদ্দেশ্য নিয়ে রাজা বল্লাল সেন গুণ, কর্ম, বিদ্যা, আচার ইত্যাদির উপরে ‘কুলীন’ সম্মান প্রদান করতেন যা সময়ের ব্যবধানে একটি সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়। একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর ‘কুলীন’ নির্বাচন পদ্ধতিটি চলে গেলো জন্মগত অধিকারে। কুলীণের সন্তান কুলীন হতে থাকায় কুলীনদের আধিপত্য সমাজজুড়ে বিস্তার লাভ করে এবং ব্যবসার অন্যতম মাধ্যম হতে থাকে এই ‘কুলীন’ সম্মান। বিয়ে ব্যবসা। একজন কুলীন শ’য়ে শ’য়ে বিয়ে করে অর্থ সংগ্রহ করতো। দাম্পত্যের ধারণা এই বিয়েতে নেই। ফলে, নারীরা হতে থাকে চরম অবহেলিত ও বঞ্চিত। নারীদেরও যে কামনা থাকতে পারে, নারীদেরও যে জীবনাকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে এমন চিন্তা কেউ করতে পারতো না। এই কৌলিণ্য প্রথার বিরুদ্ধে বঙ্কিমচন্দ্রসহ সমকলের অনেক গুণীজন সরব ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র সারাজীবন এই কুপ্রথাগুলোর বিরোধিতা করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বলেছিলেন- “বিধাতা বিদ্যাসাগরের প্রতি বঙ্গভূমিকে মানুষ করিবার ভার দিয়াছিলেন”। বিভূতিভূষণ তাঁর ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাস

Society Language and Culture

শুরু করেছেন এই প্রথার কুফল দেখিয়ে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে এই প্রথার বিরোধিতা করেছেন; পাশাপাশি তিনি নারী-পুরুষের সম্পর্কের একটি আধুনিক চিত্র তুলে ধরেছেন। নবকুমার চাইলেই একাধিক বিবাহ করতে পারলেও সে তা না করে একজন স্ত্রীর সাথে সংসারজীবনকে যাপন করার যে চিন্তা সে ব্যক্ত করেছে তা নিঃসন্দেহে কৌলিন্য প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে মূল্যায়িত হয়।

তৎকালের আর একটি ভয়াবহ সমস্যা ছিলো 'বহুবিবাহ', যেটি কৌলিন্য প্রথার সাথেই যুক্ত। এই দুটি সমস্যা একে অপরের সাথে যুক্ত হলেও অবশ্যই এক নয়। আমরা এই নিবন্ধে কৌলিন্য প্রথার সাথে যুক্ত 'বহুবিবাহ' নিয়ে আলোচনা করবো। একজন কুলীন ব্রাহ্মণ তালিকা ধরে শ্বশুরবাড়িতে যেতো এবং অর্থ সংগ্রহ করে চলে যেতো অন্য কোনো গ্রামের শ্বশুরবাড়িতে। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে শ্যামাসুন্দরীর স্বামীকে আমরা এমনই চিত্রে পাই। বঙ্কিমচন্দ্র এই সমস্যাটির প্রতিকার হিসেবে আধুনিক দাম্পত্য বা একক দাম্পত্যের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। নবকুমার নিজে একজন কুলীন ব্রাহ্মণ হয়েও বহুবিবাহকে অস্বীকার করেছে। একক দাম্পত্যের প্রতি সে ছিলো অনুরাগী। কপালকুণ্ডলাকে বিয়ের পরে যখন মতিবিবির সাথে তার সাক্ষাৎ হয় তখন মতিবিবি তাকে প্রণয় নিবেদন করলে সে তা প্রত্যাখ্যান করে। পরবর্তীতে মতিবিবি তার আসল পরিচয় নবকুমারকে জানালে নবকুমার বলে, "তুমি আবার আগ্রায় ফিরিয়া যাও, আমার আশা ত্যাগ করো" [১]। নবকুমার চাইলে মতিবিবি অর্থাৎ পদ্মাবতীকে আবার গ্রহণ করতে পারতো, চাইলে একসাথে দুই স্ত্রীকে নিয়ে সংসার করতে পারতো; কিন্তু সে সেটা করেনি। একটা চলমান প্রথাকে অস্বীকার করাই হলো সেটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা। বঙ্কিমচন্দ্র বেশ চাতুরতার সাথে বহুবিবাহের প্রতি একটি তীব্র প্রতিবাদ ব্যক্ত করেছেন।

এই উপন্যাসের আর একটি বিষয় বেশ গুরুত্বপূর্ণ, সেটি হলো কাপালিকদের দেহ সাধনার বিষয়টি। দেহ সাধনার বিষয়টি বেশ জটিল এবং অত্যন্ত শ্রমসাধ্য একটি প্রক্রিয়া। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ্য চর্যাপদেও আমরা এক ধরণের দেহ সাধনার চিত্র দেখতে পাই যার সাথে 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে করা কাপালিকের দেহসাধনার মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। দেহ সাধনার বিষয়টি ছিলো চিত্তকে সুদ্ধ করার মাধ্যমে বিষয়াসক্তি ত্যাগ করা এবং সাধনা করার মাধ্যমে বীর্যকে শরীরের মধ্যেই সংরক্ষণ করা। বীর্যের গতিকে নিম্নগামী না করে উর্দ্ধগামী করা। এই প্রক্রিয়াকে বলা হতো 'উর্দ্ধরেত'। এই সাধনার ফলে নিজ শরীরের প্রতি একটা নিয়ন্ত্রণ চলে আসে। এমনকি তারা চাইলে নিঃশ্বাসকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারতো। দেহ সাধনার এই রূপটি আমরা 'কপালকুণ্ডলা'র এই কাপালিকের মধ্যে দেখতে পাই না। এই কাপালিকের সাধনার ধরণ ভিন্ন। সেও সাধনা করছে, যেটা দেহ নির্ভর; কিন্তু সে অন্যের দেহ নিয়ে নিজের সাধনা করছে। অন্য একটি দেহকে নিজের সাধনার কাজে ব্যবহার করছে। নবকুমার হলো সেই মনবদেহ। কালীর তুষ্টি অর্জনের জন্য কাপালিক নবকুমারকে বলি দিতে চায়। আবার কপালকুণ্ডলাকেও সে একটা সময় ব্যবহার করতো পালিয়ে না আসলে, এমন বিষয়ের ইঙ্গিত আধিকারীর কাছ থেকে আমরা পাই। এখানেই চর্যাপদে উল্লেখিত দেহ সাধনার থেকে কপালকুণ্ডলায় উল্লেখিত দেহসাধনার পার্থক্য। চর্যাপদে কাপালিকেরা নিজের দেহ নিয়ে সাধনা করছে আর কপাকুণ্ডলার কাপালিক অন্যের দেহকে নিজের সাধনায় ব্যবহার করছে। এই কাপালিকের দেহ সাধনারই একটি অংশ কপালকুণ্ডলা নিজেই, যে কাপালিকের এই দেহ সাধনা থেকে বের হয়ে এসে যুক্ত হয়েছে আধুনিক দাম্পত্যে। 'কপালকুণ্ডলা'য় যে আধুনিক দাম্পত্যের সুর ভাসে, সে সুর কপালকুণ্ডলাকে ঘিরেও আবর্তিত হয়েছে বেশ সাবলীল ভাবে।

Society Language and Culture

কৌলিন্য প্রথা, বহুবিবাহ এবং দেহ সাধনার বিষয়গুলোকে ছাপিয়ে আধুনিক দাম্পত্য-সম্পর্কের বিষয়টি এই উপন্যাসে বেশ চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। যে সময়ে বহুবিবাহ সমাজের একটি স্বীকৃত এবং খুবই স্বাভাবিক বিষয় হিসেবে বিবেচিত হতো, সেই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র এই আধুনিক দাম্পত্যের ধারণা দিলেন। ইউরোপীয় আদর্শে তিনি বেশ প্রভাবিত ছিলেন। তিনি ইউরোপীয় আদর্শকে শুধুমাত্র গ্রহণ করেননি, তা সমাজের সকল স্তরে ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছেন। 'কপালকুণ্ডলা'তে তিনি যে আধুনিক দাম্পত্যের ইঙ্গিত দিয়েছেন তা মূলত ইউরোপীয় চেতনা থেকে গ্রহণ করেছেন বা অনুকরণ করেছেন। আধুনিক দাম্পত্য মূলত একক দাম্পত্য; যেখানে একজন নারী ও একজন পুরুষকে কল্পনা করা হয়, একাধিক নারীর বিষয় থাকা চলে না। এই আধুনিক দাম্পত্যের চেতনা 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের তিনটি চরিত্রের মধ্যে দেখা যায়- নবকুমার, মতিবিবি (পদ্মাবতী) ও শ্যামা সুন্দরী। নবকুমার একজন কুলীন ব্রাহ্মণ। একাধিক বিয়ে করা তার জন্য কোনো বাধা নয়, কিন্তু তা সত্ত্বে সে একাধিক বিয়ে করেনি। শুধুমাত্র কপালকুণ্ডলাকে নিয়েই সে সংসার করতে চেয়েছে। তাই মতিবিবির প্রণয় নিবেদনকে সে খুব সহজেই প্রত্যাখ্যান করতে পারলো। নবকুমার যে একক দাম্পত্যের প্রতি তীব্র অনুরাগী তা শেষ দৃশ্যে ব্যক্ত হয় কপালকুণ্ডলাকে নিয়ে সুখের সংসার বাঁধার আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে। নবকুমার বলে- " এই তোমার পায়ে লুটাইতেছি- একবার বল যে, তুমি অবিশ্বাসিনী নও- একবার বল, আমি তোমায় হৃদয়ে তুলিয়া গৃহে যাই [২]।

এই উপন্যাসে মতিবিবি রীতিমতো ভোগের প্রতীক হিসেবে চিত্রিত হলেও নবকুমারকে দেখার পর তার মধ্যে প্রেমের প্রবাহ জাগ্রত হতে দেখা যায়। সে আগ্রা থেকে ফিরে আসে শুধুমাত্র নবকুমারের জন্য। সে নবকুমারকে একক ভাবে পেতে চায়, তাই কপালকুণ্ডলাকে ধন, দাসদাসী, প্রতিপত্তি সবই দিয়ে দিতে চায় এবং বিনিময়ে শুধুমাত্র নবকুমারকে একা পেতে চায়। সে কপালকুণ্ডলার সাথে নবকুমারকে ভাগাভাগি করতে চায় না। এই যে তার মধ্যে একক দাম্পত্যের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে তা আমাদের ইউরোপীয় আধুনিক দাম্পত্যের প্রতিই ইঙ্গিত দেয়।

আবার শ্যামা সুন্দরীও চায় তার স্বামীকে বশে রাখতে। তার বিশ্বাস রাতে এলোচুলে বন থেকে বশীভূত করার ঔষধ খাওয়াতে পারলে স্বামীকে কাছে রাখা যাবে। সে নিজেই একজন কুলীন ব্রহ্মণের স্ত্রী, তাই স্বামীকে সে কাছে পায় না সবসময়। তার ইচ্ছা স্বামীকে বশ করে সবসময় তার কাছে রাখতে। অর্থাৎ তার স্বামীকে সে এককভাবে পেতে চায়। স্বামীকে বশ করে কাছে রাখা এবং একা পাওয়ার বিষয়টিই তো একক দাম্পত্য।

আধুনিক যুগের সাহিত্যে মানুষকেই প্রধান হিসেবে দেখা হয়, তাই মানুষের মনকে আশ্রয় করে সাহিত্যের বিস্তার আমরা শুধুমাত্র এই আধুনিক সাহিত্যেই দেখতে পাই। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসটি এই আধুনিকতারই একটি ধাপ যেখানে আধুনিক দাম্পত্যের বিষয়টি সবকিছুকে ছাপিয়ে উজ্জল হয়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্র:

১. কপালকুণ্ডলা, ৩য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

২. কপালকুণ্ডলা, ৪র্থ খণ্ড, ৯ম পরিচ্ছেদ।

Society Language and Culture